অধ্যায় – ৪

লৌহশিল্প, ধাতুশিল্প (ডোকরা-পিতল কাঁসা) এবং স্বর্ণনির্মিত তৈজসপত্র ও পুরাতন অস্ত্র-শস্ত্র

সুপ্রাচীন কাল থেকেই ধাতুর সঙ্গে মানুষের পরিচয় গড়ে উঠেছে। ধাতু মানব-সংস্কৃতির অগ্রগতির পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। লোহা, তামা, দস্তা, অ্যালুমিনিয়াম, নিকেল প্রভৃতি সব ধাতুই সভ্যতার ভিত্তিভূমি তৈরিতে বিশেষ সহায়ক। প্রকৃতিতে যে লোহার খনিজ ভাণ্ডার আছে তা থেকে লোহা সংগ্রহ করা হয়। মধ্যযুগে যখন আধুনিক যন্ত্র এবং প্রযুক্তি বিজ্ঞানের সূত্রপাত হয় নি, তখন লোকায়ত মানুষ আগুনে লোহা পুড়িয়ে পিটিয়ে শিল্প সৃষ্টি করেছেন। মধ্যযুগে বৃত্তি এবং সম্প্রদায় সমার্থক ছিল। স্বাভাবিকভাবে জাতি বিভাগ এবং কর্মবিভাগ অভিন্ন হয়ে ওঠে। কামার সম্প্রদায়ভুক্ত লোকগোষ্ঠী লৌহ শিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে ওঠেন। ঐতিহ্য, উত্তরাধিকার এবং অভিজ্ঞতা শিল্প সৃষ্টিতে তাদের দক্ষতা অর্জনে সহায়ক হয়। এভাবেই কামারদের এক বিশেষ শ্রেণী যারা ডোকরা কামার নামে চিহ্নিত, তারা পিতল কাঁসার শিল্প সৃষ্টিতে বিশেষত্ব অর্জন করেন। সমগ্র মধ্যযুগ জুড়ে ঐতিহ্য-অভিজ্ঞতা এবং উত্তরাধিকারকে পাথেয় করে যে কামার সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছিল, তারা আধুনিক প্রযুক্তি বিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়াই শিল্প সৃষ্টির বিশেষ প্রকৌশলের জ্ঞান অর্জন করেছিল। শত শত বৎসর ধরে তারা লোহার উন্নত শিল্প সামগ্রী মানব সভ্যতাকে উপহার দিয়েছে। মনসামঙ্গল কাব্যের কেসাই কামার লোহার বাসরঘর নির্মাণ করে সুদূর মধ্যযুগে উন্নত স্থাপত্য কলার পরিচয় রেখেছেন।

এরপর ভক্তি আশ্রিত বাংলাদেশে দেববাদ যখন সমাজদেহে বিশেষ জায়গা নেয়, তখন শিল্পের সঙ্গে দেবতা পরিকল্পনা অনিবার্য হয়ে ওঠে। হিন্দুসমাজে বিশ্বকর্মা হয়ে ওঠেন শিল্পের দেবতা। আর কামার সম্প্রদায় বিশ্বকর্মার আশীর্বাদ পুষ্ট হয়ে ওঠেন। স্বভাবতই কামারের জাতিদেবতা রূপে বিশ্বকর্মা চিহ্নিত হয়ে ওঠেন। আর দেবী লক্ষ্মী হলেন কামারের কুলদেবী।

ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন শিল্পগুলির মধ্যে লৌহশিল্প অন্যতম। এছাড়া ডোকরা কামারদের পিতল কাঁসার শিল্পও গুরুত্বপূর্ণ। ধাতু নির্ভর শিল্পীদের মধ্যে কামারেরা প্রাচীন শিল্পীকুল। কামারপাড়া বাংলাদেশের গ্রামে গঞ্জে গড়ে উঠেছে। লোহার শিল্পসৃষ্টির জন্য কামারেরা বিশেষ নিজস্ব প্রযুক্তিতে কামারশাল গড়েন। সাধারণত কামারেরা কৃষিসংক্রান্ত এবং গৃহস্থালী শিল্প সামগ্রী তৈরি করেন। অন্যান্য বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়ের তুলনায় কামারদের শিল্পকাজ অনেকটাই শ্রমসাপেক্ষ। কামারশালে লোহা এবং আগুনের সঙ্গে শিল্পীদের কাজ করতে হয়। কয়লার আগুন জ্বেলে, হাপর টেনে টেনে লোহা পুড়িয়ে কামারেরা কাজ করেন। গভীর রাত্রিতেও কর্মক্লান্ত শরীরে কামারেরা কাজ করেন। প্রজন্মের পর প্রজন্ম জুড়ে তাদের কাজ। তাদের অবসর নেই। মধ্যযুগে প্রতিটি গ্রাম এবং পাড়া স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠেছিল এভাবে। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের অবজ্ঞাকে উপেক্ষা করে শিল্পীরা স্বাধীনভাবে স্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। মধ্যযুগের কামারেরা স্থাপত্যকলায় বিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন।

কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে উল্লিখিত লৌহজাত শিল্পসামগ্রীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল টাঙ্গি, কোদাল, কুড়ুল-কুঠার, কাটারি-কাঠদা, খন্তা, ছুরি, লোহার শিকলি, লোহার সাবল প্রভৃতি। কোন কোন শিল্পী বিশেষ শিল্পকাজে পারদর্শিতা অর্জন করেন। যারা কোদালের কাজে পারদর্শী তাদের বলা হয় কোদালিয়া। যারা কুঠার দিয়ে গাছ কাটেন, তাদের বলা হয় কাঠুরিয়া। কামারদের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী সম্প্রদায় হলেন ডোকরা কামার। মুকুন্দরামের কাব্যে ডোকরা শিল্পের বিস্তর নজির ছড়িয়ে রয়েছে। এগুলির মধ্যে বাটি, ঘটি এবং থালার উল্লেখই বেশি। নিম্নবর্গীয় অন্ত্যজ ডোকরাদের কোন স্থায়ী বাসস্থান ছিল না। বর্তমানে যাযাবর শিল্পী সম্প্রদায় ডোকরারা স্থায়ী বাসস্থান পেয়েছে। মুকুন্দের কাব্যে পিতল কাঁসার শিল্পের মধ্যে বাটি, ঘটি এবং থালার উল্লেখই বেশি। এগুলি ব্যবহারিক শিল্প সামগ্রী রূপে ব্যবহৃত হলেও মঙ্গলদ্রব্য রূপেও এগুলির ব্যবহার আছে। স্বর্ণ অলংকার ছাড়া গৃহস্থালী দ্রব্যরূপে সেকালে অভিজাত বনেদি বাড়িতে স্বর্ণনির্মিত তৈজস ব্যবহার করা হত। কবিকঙ্কণের কাব্যে সোনার কলম এবং সোনার গাড়ুর উল্লেখ আছে। গুজরাট নগরে দেবী চণ্ডীর মন্দিরে সোনার কলসের চূড়ায় নেতের পতাকা ওড়ার কথা বলা হয়েছে। বণিকখণ্ডে অভিজাত বণিক রমণী লহনা সোনার গাড়ুতে ঘি রেখেছেন।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মধ্যযুগের বিভিন্ন অস্ত্রের উল্লেখ আছে। এগুলির মধ্যে প্রধান হল- তির, টাঙ্গি, ধনুক, বাটুল, কামান, ত্রিশূল, পট্টিশ, মুদ্গার, বাণ, খড়্গ (খাড়া) প্রভৃতি। এছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মরক্ষার্থে ব্যবহৃত বর্মও কবিকঙ্কণের কাব্যে এসেছে। চণ্ডীমঙ্গলে তীর এবং ধনুক অনার্য অস্ত্ররূপেই পরিগণিত। বাটুল চামড়া এবং কাঠ দিয়ে তৈরি। বাটুল ছোড়া হয় লোহার তৈরি গুলি সংযোগ করে। বাটুল অনার্য লোকশিল্প। কালকেতু বাটুল নিয়ে শিকার করতেন। মধ্যযুগে কামানের উল্লেখ আছে মুকুন্দের কাব্যে। যারা কামান তৈরি করেন তাদের বলা হত কামানিঞা। কালকেতুর সঙ্গে কলিঙ্গরাজের যুদ্ধে কামান ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্ররূপে খড়্গ সুবিদিত। আত্মরক্ষার্থে বহি:শত্রুর আক্রমণ মুক্ত হওয়ার কারণে নানা অস্ত্রের প্রয়োজন হত। শিল্প সৃষ্টি করার সময় কামার সম্প্রদায়ের শিল্পীরা যুগগত সংস্কার-বিশ্বাস এবং ট্যাবুকে মান্যতা দিতেন। শুধু প্রয়োজন নয়, শিল্পীর শিল্পে প্রয়োজন অতিরিক্ত সৌন্দর্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। নানা মোটিফ চিত্রকলায় ভরপুর কামারদের সৃষ্ট শিল্প। নানা দেশজ এবং লোকজ চিত্রকলা, প্রকৃতি-নিসর্গ এবং পৌরাণিক পটভূমি সমৃদ্ধ মোটিফ কামারদের সৃষ্ট শিল্পকে পূর্ণতা দিয়েছে।

লৌহজাত শিল্প

কামার সম্প্রদায়ের শিল্পীরা লৌহজাত শিল্প সামগ্রী তৈরি করেন। Herbert Hope Risley তাঁর 'The Tribes and Castes of Bengal' গ্রন্থে লিখেছেন – "Kamar, Kamar, the metal-working caste of Bengal [...] of the Sudra caste." [১] কামারেরা ধাতু নির্ভর শিল্পীদের মধ্যে সব থেকে পুরানো। বাংলাদেশের গ্রামে গঞ্জে কামার পাড়া আছে। কামারেরা কামারশাল গড়েন। সাধারণত কামারেরা চাষবাস এবং গৃহস্থালী বিষয়ক লোহার শিল্প সামগ্রী তৈরি করেন। এককালে কামারের তৈরি শিল্প সামগ্রী দিয়েই কৃষিকাজ হত। কিন্তু একালে যন্ত্রযুগের প্রসারের ফলে কামারেরা বৃত্তি পরিবর্তন করেছেন। বাংলাদেশের কামারেরা কৃষিক্ষেত্র এবং গার্হস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যবহৃত নানা লোহার জিনিসপত্র প্রস্তুত করেন। কামারেরা এখনও কামারশালে কোদাল, কাটারি, কাস্তে, শাবল, কুড়ুল, বটি, কাঁচি, ক্ষুর, চাবি প্রভৃতি লোহার নানা জিনিস প্রস্তুত করেন। কামারেরা বিশ্বকর্মার আশীর্বাদ ধন্য। অর্থাৎ কামারদের জাতি

দেবতা হলেন বিশ্বকর্মা এবং 'কুলদেবী' লক্ষ্মী। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তাঁর 'লোহার ব্যথা' কবিতায় লিখেছেন –

"ঠকা ঠাঁই ঠাঁই কাঁদিছে নেহাই, আগুন ঢুলিছে ঘুমে,

শ্রান্ত সাঁড়াসি, ক্লান্ত ওষ্ঠে আলগোছে ছেনি চুমে"। (২)

কবির কথায় হাপরের শ্বাস টান, কামারের ঘামে, যন্ত্রণার শ্বাসে সৃষ্টি হয় শিল্প। 'A Dictionary of Symbols' গ্রন্থে J.E. Cirlot বলেছেন – " In the Rigveda, the creator of the world is a blacksmith, This may be accounted for by the associated symbolism of fire, but also by the fact the iron is associated with the astral world - the first iron known to man was meteoric – and with the planet Mars." (৩)

মধ্যযুগে গ্রামীণ শিল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল লৌহজাত শিল্প। R.V. Russell তাঁর 'The Tribes and Castes of The Central Provincss of India' গ্রন্থে লিখেছেন – " The Lohar or blacksmith makes and melts the iron implements of agriculture, such as the ploughshare, axe, sickle and goad ". (৪)

কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে লৌহজাত শিল্পগুলির মধ্যে টাঙ্গি, কোদাল, কাটারি, কুঠার, কাঠদা (কুড়ুল বা কাটারি) উল্লেখযোগ্য। ঋগ্বেদ সংহিতায় লৌহজাত শিল্পের উল্লেখ আছে। ৫ম মণ্ডলের ৩০ সূক্তে ' উজ্জ্বল লৌহ কলস' গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে -

"চতুঃসহস্রং গব্যস্য পশ্বঃ প্রত্যগ্রভীষ্ম রুশমেস্বগ্নে

ঘর্মশ্চিত্তপ্তঃ প্রবৃজে য আসীদয়স্ময়স্তস্বাদাম বিপ্রাঃ" ।।১৫।। (৫)

টাঙ্গি – কামারেরা লোহা দিয়ে টাঙ্গি তৈরি করেন। ধারালো এই অস্ত্র দিয়ে গাছ কাটা হয়। কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বেশ কয়েকবার টাঙ্গির উল্লেখ এসেছে। আখেটিক খণ্ডে কালকেতু চণ্ডীর কৃপায় অর্থলাভ করে গোলাহাট থেকে অন্যান্য সামগ্রীর

সঙ্গে কিনেছেন টাঙ্গি। বীর যোদ্ধা কালকেতু যুদ্ধের প্রয়োজনে বিভিন্ন যুদ্ধাস্ত্র কিনেছেন। বোঝা যাচ্ছে মধ্যযুগে যুদ্ধের প্রয়োজনে টাঙ্গি ব্যবহৃত হত। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

"তবক বেলক টাঙ্গি ভিন্দিপাল সেল সাঙ্গি

ভুসণ্ডি ডাবুষ খরসান"। (৬)

কালকেতু পশুদের সঙ্গে যুদ্ধেও টাঙ্গি ব্যবহার করেছেন –

"খর টাঙ্গি ধরি বীর কাটে করিমুণ্ড

বালকে যেমন কাটে ইক্ষুর দণ্ড"(৭)

গুজরাট নগর পত্তনের জন্য জঙ্গল কেটে প্রজাবসতির প্রয়োজন। জঙ্গল কাটার প্রয়োজনে টাঙ্গি ব্যবহৃত হয়েছে। মহাবীর বন কাটার আদেশ দিয়েছেন। শ্রমিকেরা দেশ দেশান্তর থেকে এসেছেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

"মহাবীর কাটে বন শুনি বেরুনিঞা জন

আইসে তারা দেশে দেশে হইতে"। (৮)

টাঙ্গি দিয়ে কালকেতু বাঘের দাঁত ভাঙ্গছেন –

"পেলিআ মারিআ টাঙ্গি বাঘের দশন ভাঙ্গি

লেঞ্জে ধরি দিল পাকনাড়া" (৯)

এমনকি কালকেতু টাঙ্গি দিয়ে হাতির দাঁত কেটে ফেলেছেন –

"একবাণে করি অন্ত টাঙ্গি দিয়া কাটে দন্ত

হাটে নিঞা বেচে কালকেতু" (১০)

টাঙ্গ নামেও টাঙ্গির উল্লেখ কাব্যে এসেছে। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

"বন কাটে বেরুনিঞা জন

শর নল খাকড়া ইকড়ি টাঙ্গ

ওকড়া ধুথুরা কাটে অপাঙ্গ”।[১১]

কামারেরা কুঠার কোদাল এবং টাঙ্গি তৈরি করেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

“কামার পাতিয়া শাল কুঠারি কোদাল ফাল

গড়ে টাঙ্গি অঙ্গরখি সেল”। [১২]

যুদ্ধক্ষেত্রেও টাঙ্গির ব্যবহার উল্লেখ করেছেন কবিকঙ্কণ –

“টানাটানি করে চুলে ধরিআ কোটাল

টঙ্গ টাঙ্গি কেহ হানে কেহ করবাল”। [১৩]

বণিকখণ্ডেও যুদ্ধক্ষেত্রে টাঙ্গির ব্যবহার হয়েছে। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

“গায় আরোপিল রাঙ্গি কাছিল লসান টাঙ্গি

নয় শত চলে যেন কাল”। [১৪]

একইভাবে সিংহল দেশের যুদ্ধেও ব্যবহৃত হয়েছে টাঙ্গি। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

“টঙ্ক টাঙ্গি কেহ হানে কেহ করবাল”। [১৫]

যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীমন্ত শেল টাঙ্গি নিয়ে যুদ্ধ করছেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

“করে ধরি সাঙ্গী ধায় রণরঙ্গী

তোমর টাঙ্গি শেল”। [১৬]

কামারেরা লোহা গলিয়ে সাধারণত কৃষি সহায়ক শিল্প তৈরি করেন। এছাড়া অস্ত্র-শস্ত্রও তৈরি করেন। কামারদের মধ্যে সংস্কার বিশ্বাস এবং ট্যাবুর প্রচলন আছে। ড. অনিল কুমার ঘোষ ‘গ্রামীণ শিল্পায়ন’ গ্রন্থে লিখেছেন – “রাঢ় অঞ্চলে রাণা ও অষ্টলই কর্মকারদের মধ্যে দুটি ট্যাবু প্রচলিত আছে – ১) রবিবার মূল ধাতু অর্থাৎ তামা গলানো নিষিদ্ধ। ২) হস্তি, লক্ষ্মীদেবী এবং বিশ্বকর্মার বাহন। কর্মকার জাতির কুলদেবী লক্ষ্মী এবং জাতিদেবতা বিশ্বকর্মা। তাই কর্মকার জাতির মানুষ কখনও হাতির পিঠে চাপবে না”। [১৭]

কোদাল - কামারেরা কামারশালে লোহা দিয়ে কোদাল তৈরি করেন। কোদাল মূলত কৃষিকাজ এবং মাটি কোপানোর কাজেই প্রয়োজন হয়। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আখেটিক খণ্ডে কোদালের ব্যবহার এসেছে। দেবী চণ্ডী কৃপাবশত কালকেতুকে মানিক অঙ্গুরি দিয়েছেন। কিন্তু সরলা ফুল্লরা তাতে সন্তুষ্ট নন। পার্বতীর অভিলাষ বুঝে দেবী চণ্ডী তাকে দিয়েছেন কোদাল এবং খন্তা –

'লহ খুড়ি কোদাল খন্তা খুরধার

কোদাল খন্তা মাতা না পাই নিয়ড়ে

তুমি আজ্ঞা দিলে মাতা কোড়িব চেয়াড়ে"। (১৮)

কোদালে যারা কাজ করেন, তাদের 'কোদালী' বা 'কোদালীয়া' বলা হয়। দেবী চণ্ডী বিশ্বকর্মাকে পুরী নির্মাণের আদেশ দিয়েছেন। শ্রমিকের বেশ ধরে বিশ্বকর্মা পুরী নির্মাণ করছেন। আর হনুমান কোদালিয়া হয়ে কোদাল ধরে দীঘি এবং প্রাচীর নির্মাণ করছেন। এভাবে পুরী নির্মাণ সম্পূর্ণ হচ্ছে। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

'জখন কোদাল ধরে বীর হনুমান

বাসুকী নাগের শির হয় কম্ফমান"। (১৯)

কামারেরা শাল পেতে কোদাল তৈরি করেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

'কামার পাতিয়া শাল কুঠারি কোদাল ফাল"। (২০)

কামারশাল পাতেন কামার। এভাবেই বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়ের শিল্পীরা বাংলার গ্রামে গ্রামে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত শত শত বৎসরের অভিজ্ঞতা প্রসূত শিল্পসৃষ্টিতে প্রয়াসী হয়ে ওঠেন। কোদাল গ্রামবাংলার গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় শিল্প। যারা কেবল কোদাল দেওয়ার কাজে দক্ষ হয়ে ওঠেন, তাদের বলে কোদালিয়া। কিন্তু কামারের কামারশাল এখন সংকটের মুখে। কোদাল এখন বড় বড় শিল্প কারখানায় তৈরি হয়। কামারশালের সংখ্যা কমে এসেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি লোকশিল্পের সংকট ত্বরান্বিত করেছে।

কুড়ুল-কুঠার, কাটারি-কাঠদা – কামারেরা কুড়ুল, কাটারি, কুঠার প্রভৃতি লোহার জিনিস তাদের নিজস্ব কামারশালে তৈরি করেন। কবিকঙ্কণের কাব্যে কাঠদা বা কুড়ুল বা কাটারির উল্লেখ এসেছে। বন কেটে প্রজাবসতি করার জন্য কালকেতু কামারের কাছ থেকে কিনেছেন কাঠদা (কুড়ুল) এবং কুঠার। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

"কাঠদা কুঠারি বাসী টাঙ্গী কিনে রাশি রাশি

কিনে বীর সভাকারে দিতে"। (২১)

ধনপতির নৌকা দ্বীপের মধ্যে হদ-জঞ্জালে আটকে আছে। কাটারি দিয়ে হদ কেটে ধনপতি নৌকা নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

"রসান কাটারি নৌকার আগেতে বান্ধিয়া

বুদ্ধিবলে গেল সাধু হাদি কাটিয়া"। (২২)

কামারশালে কামারেরা লোহা দিয়ে লাঙলের ফালও তৈরি করেন। আখেটিক খণ্ডে এমন ফালের উল্লেখ আছে। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

"কামার পাতিয়া শাল কুঠারি কোদাল ফাল

গড়ে টাঙ্গি অঙ্গরখি সেল"। (২৩)

সেকালে কৃষিকাজের জন্য লাঙল ছিল অপরিহার্য। সমগ্র মধ্যযুগ জুড়ে বাংলাদেশে লাঙলের ব্যবহার ছিল। রামেশ্বর ভট্টাচার্যের "শিবায়ন' কাব্যের অনেক অংশ জুড়ে কৃষি-কৃষক এবং কৃষি নির্ভর প্রযুক্তির উল্লেখ আছে। সমগ্র বাংলাদেশে কোন জাতি সম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন ছিল না, জাতি-সম্প্রদায় ছিল সমগ্র সমাজদেহের অংশ। ছিল পরস্পরাশ্রয়ী। সামাজিক-সংহতি, সমাজ কেন্দ্রিকতা, লোকজীবনকে টান টান সুতোয় বেঁধে দিয়েছিল। কামারেরা সমাজদেহের পুষ্টি সাধনে রত ছিলেন। ছিলেন প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর।

খন্তা – ফুল্লরা দেবী চণ্ডীর দেওয়া মানিক অঙ্গুরী কালকেতুকে নিতে নিষেধ করেছিলেন। বরং পার্থিব দৈনন্দিন ব্যবহার্য সামগ্রীতেই ফুল্লরা সন্তুষ্ট থাকেন। ফুল্লরার অভিলাষ চণ্ডী বুঝেছেন। ফুল্লরাকে দিয়েছেন – "লহ খুড়ি কোদাল খন্তা খুরধার" [২৪]

ছুরি- কালকেতুর গুজরাট নগরে মুসলমানরা বসেছেন। নগরের পশ্চিমদিক কালকেতু তাদের বসতির জন্য দিয়েছেন। তারা নমাজ পাড়েন। আর ছুরি দিয়ে মুরগী জবাই করেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

"করে ধরি করা ছুরি মুরগী জবাই করি

দশ গণ্ডা দরে পায় কড়ি"। [২৫]

কামারের কঠিন মুঠিতে তৈরি ছুরি জীবিকার নিত্য প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়।

লোহার শিকলি - লোহার ছোট ছোট শৃঙ্খলযুক্ত চেন হল শিকলি। প্রাচীন দাস ব্যবস্থায় মানুষের পায়ে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হত। এছাড়া হাতি ঘোড়াকে পায়ে লোহার বেড়ি লাগানো হত। ঘোড়ার মুখনালিও কামারেরা প্রস্তুত করতেন। কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে শিকল এবং বেড়ির উল্লেখ এসেছে নিম্নলিখিতভাবে – [নিম্নোক্ত লোকশিল্পের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি তথ্যসূচীতে উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া] [২৬]

১) লোহার শিকল (পৃ: ৬৫), ২) গজের শিকল (পৃ: ৯৬), ৩) ঘোড়ার মুখনালি (পৃ: ২৬৯), ৪) লোহার বেড়ি (পৃ: ২৬৪)।

কলিঙ্গরাজ কালকেতুকে শেকল দিয়ে বেঁধেছেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

" গজের শিকল দিআ বান্ধি মহাবীরে

বাঘহাতা হাথে দিল গলায় জিঞ্জিরে"। [২৭]

লোহার শাবল – কামারেরা দৈনন্দিন প্রয়োজনে লোহার শাবল বা গাইতি তৈরি করেন। মাটি খোড়ার কাজে শাবল প্রয়োজনীয় সামগ্রী। কবিকঙ্কণ শিশু কালকেতুর দুই বাহুকে লোহার শাবলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। মুকুন্দরাম লিখেছেন –

"নাখ মুখ চক্ষু কান কুন্দে জেন নিরমান

দুই বাহু লোহার শাবল"। [২৮]

কামার সম্প্রদায় ছাড়াও বাংলাদেশে লোহার শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মুসলমান এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের দুটি জনগোষ্ঠী পাওয়া যাচ্ছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীটিকে বলা হয় লোহার। আবদুস সামাদ তাঁর 'বাংলার জনজাতি' গ্রন্থে লিখেছেন – "(লোহার): বাংলার অন্যতম আর একটি বিশেষ জনগোষ্ঠী হল এটি। বিহারের একমাত্র লৌহকর্মের সঙ্গে যুক্ত বার্হিসের অন্যতম শাখা গোষ্ঠী হল এই লোহার জনগোষ্ঠী। বিহারের কর্মকারের সমগোত্রীয় হল এটি"। [২৯]

এছাড়া কামিয়া লোহারদের পরিচয় পাওয়া যায়। এরা মূলত ধর্মান্তরিত মুসলমান জনগোষ্ঠী। আবদুস সামাদ তাঁর 'বাংলার জনজাতি' গ্রন্থে লিখেছেন – "এটি মূলতঃ ও বস্তুতঃ হিন্দু লোহার জাতির বিশেষতঃ নেপাল থেকে স্থানান্তরিত গোঁড়া হিন্দু 'কামিয়া লোহার' গোত্র শাখাটিরই অন্তর্ভূক্ত ছিল। কিন্তু পরবর্তী যথা সংশ্লিষ্ট সময়কালে এঁদের অনেকেই মুসলমান ধর্মান্তরিত হয়ে গিয়েছেন"। [৩০]

পিতল – কাঁসার শিল্প

Herbert Hope Risley তাঁর 'The Tribes and castes of Bengal' গ্রন্থে আট প্রকার কামারের উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন--"From this were forged eight different kinds of iron, Corresponding, it is said to the eight classess of kamar known in Midnapore, [.....] (7) Dhokras, and (8) Tamras, Two lower classess of kamars, found in the jungle Mahals in the West of the districts who eat fowls, are reekoned unclean, and are served by a degraded class of Brahman." [৩১]

ডোকরা প্রাচীন ধাতু শিল্প। শিল্পীরা ডোকরা কামার। মেদিনীপুর জেলায় বসবাসকারী অন্ত্যজ ডোকরাদের কোন স্থায়ী বাসস্থান ছিল না। নিম্নবর্গীয় হিন্দু সমাজের যাযাবর শিল্পী ডোকরারা বর্তমানে স্থায়ী বাসস্থান পেয়েছে। মেদিনীপুর, বর্ধমান, পুরুলিয়া, মালদহে কিছু ডোকরা কামার থাকলেও তাদের অস্তিত্ব নগণ্য। মোম গলিয়ে

ঢালাই পদ্ধতিতে ডোকরা কামারেরা কাঁসা পিতলের শিল্প বিশেষত বাটি, ঘটি, থালা, ঘুঙুর, নূপুর, ছোট ছোট দেব দেবীর মূর্তি, খেলনা, ছোট বাক্স প্রভৃতি তৈরি করেন।

কবিকঙ্কণের কাব্যে ডোকরা শিল্পের নানা নজির ছড়িয়ে রয়েছে সর্বত্র। এগুলির মধ্যে বাটি, ঘটি এবং থালার উল্লেখই বেশি। থালার আলোচনা অন্যত্র করা হয়েছে। বাটি এবং ঘটি দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী। কবিকঙ্কণের কাব্যের নানা স্থানে বাটির উল্লেখ এসেছে। হিন্দুদের পূজা পার্বণ এবং মঙ্গল অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহৃত ঘটি বাটিতে হিন্দুর ধর্মীয় মোটিফ, প্রতীক এবং চিত্রকলা এঁকেছেন শিল্পীরা। ব্যবহারের ক্ষেত্রে হিন্দুর সংস্কার এবং রীতি-নীতিকে মান্যতা দেওয়া হয়। ডোকরা কামারদের নির্মিত ঘটি একালে আর মেলে না। একালে ঘটি বা গাড়ুর ব্যবহার কম। যেগুলি আছে, সেগুলিতে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ছোঁয়া লেগে আছে। কবিকঙ্কণের কাব্যে ঘটির উল্লেখ এসেছে। আখেটিক খণ্ডে কালকেতুর উপর ঈর্ষাবশতঃ ভাঁড়ু দত্ত কলিঙ্গরাজের কাছে কালকেতুর ঐশ্বর্যের বর্ণনা করেছেন—

‘পূর্বে পিত ভাণ্ডে বারি এবে তার হেমঝারি

ঘটি বাটী সব হেমময়’। (৩২)

কাঁসার শিল্প সামগ্রী কাঁসারিরা তৈরি করেন। কালকেতুর স্বপ্নের গুজরাট নগরীতে কাঁসারি সম্প্রদায় বসতি স্থাপন করেছেন। শাল পেতেছেন। ঘটি, বাটি তৈরি করেছেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

‘কাঁসারি পাতিআ শাল ঝারি খুরি গড়ে থাল

বাটী ঘটী বট-লই শিপ’। (৩৩)

আবার বণিক খণ্ডে সওদাগর ধনপতি দত্ত আহারে বসেছেন। অম্বল খাওয়ার পরই খেয়েছেন ঘটি ঘটি জল। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

‘অম্বল খাইআ পিঠা জল ঘটী ঘটী

দধি খায় ফেনি তায় শুনি মটমটী’। (৩৪)

কবিকঙ্কণ পাঠককে কখনও ভূতলোকে নিয়ে গেছেন। পিচাশ-পিচাশী আর ভূতেদের খবর দিয়েছেন পাঠককে। ভূতেদের ঘটিবাটির উল্লেখ থাকলেও তা একেবারে অলৌকিক ও অবাস্তব। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

"হাড়ে ঘটি হাড়ে বাটী নর-আঠুচাকী রুটি"।(৩৫)

কালকেতু দেবীর কৃপায় সম্পদ লাভ করে গোলাহাট থেকে কিনেছেন ঘটি—

"তৈল কিনে উমানিঞা ঘটি"। (৩৬)

বণিক খণ্ডে দেখা যাচ্ছে, সেকালে শয়ন কক্ষে ঘটি থাকত। ধনপতি দত্তের শয়ন কক্ষে এমন ঘটির উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে—

"দুই দিকে আলবাটী জলে পুর্য়া গাড়ু ঘটী"। (৩৭)

আর ঘটি যে জল খাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হত, তারও পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে কাব্যে—

"অম্বল খাইআ পিলা জল ঘটী ঘটী"। (৩৮)

হিন্দু সমাজে ঘটি বাটি নিয়ে নানা সংস্কার প্রচলিত আছে। কাঁসারিরা বাটি ঘটি তৈরি করেন। বিশ্বকর্মাকে শিল্পের দেবতা বলে মান্যতা দেওয়া হয়। 'বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ' গ্রন্থে স্বামী নির্ম্মলানন্দ লিখেছেন— "চিত্রকর, সূত্রধর, স্বর্ণকার, কাংসকার, তন্তুবায়, কর্ম্মকার, মালাকার, কুবিন্দক প্রভৃতি যে সকল শিল্পী সম্প্রদায়কে আজো আমরা নানা চারু ও কারুশিল্পে নিরত দেখি, তারা সকলেই বিশ্বকর্ম্মার সন্তান। তিনি শুধু নিজে শিল্পী নন, তিনি শিল্পীসম্প্রদায়ের জন্মদাতা ও শিক্ষাদাতা"। (৩৯)

বাটি - ঘটির মত বাটিও কাঁসারিরা তৈরি করেন। ডোকরা কামারেরা সেকালে এমন বাটি তৈরি করতেন। ডোকরা কামারদের সেই গৌরবের কাল আর নেই। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের কঠোর শাসনে একান্তই ব্রাত্য বৃত্তিজীবী শিল্পী সম্প্রদায় বৃত্তি পরিবর্তন করেছেন। কবিকঙ্কণের কাব্যে কাঁসারিরা তৈরি করেছেন কাঁসার বাটী—

"কাঁসারি পাতিআ শাল ঝারি খুরি গড়ে থাল

বাটী ঘটী বট-লই শিপ"। [৪০]

কালকেতুর ঐশ্বর্য ভাঁড়ুদত্ত কলিঙ্গরাজের কাছে বর্ণনা করেছেন। এসেছে সোনার বাটির উল্লেখ—

"ঘটী বাটী সব হেমময়"। [৪১]

বণিকখণ্ডে সোনার বাটিতে লহনা সাধু ধনপতি দত্তকে খেতে দিচ্ছেন—

"সুবর্ণের বাটিতে দুবলা দেই ঘি"। [৪২]

খুল্লনার বিবাহে দেখা যাচ্ছে, বাটি ভরে মঙ্গল দ্রব্য রাখা হয়েছে—

"তৈল সিন্দুর পান গুয়া বাটি ভর‍্যা গন্ধ চুয়া"। [৪৩]

কবিকঙ্কণের কাব্যে 'তৈল বাটি' এবং 'খুরি'র (ছোট কটোরা বা বাটি)র উল্লেখ রয়েছে। খুল্লনা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করছেন সাধু ধনপতি দত্তকে—

"অবনী লোটাইআ তৈল-বাটি এড়ে খুরি"। [৪৪]

বাস্তবে যেমন ঘর গেরস্থালীতে ঘটি বাটি পাশাপাশি থাকে, ঠিক তেমনি কাব্যেও ঘটি বাটি পাশাপাশি অবস্থান করে কবিতার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। ভূত প্রেত পিচাশের বাটি হাড়ে তৈরি হয়। এগুলি লোকশিল্প নয়, বাস্তবে এমন বাটির কোন অস্তিত্ব নেই। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

"হাড়ে ঘটি হাড়ে বাটী"। [৪৫]

বাটি সাধারণ প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক শিল্প। দেখা যাচ্ছে, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বাটী মঙ্গল দ্রব্য রূপে উল্লিখিত হচ্ছে। স্বামী নির্ম্মলানন্দ তাঁর 'বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ' গ্রন্থে লিখেছেন— 'শিল্পকলার ক্ষেত্রেও তেমনি ধর্ম্মই এদেশের প্রেরণার মূল উৎস। সত্য, শিব ও সুন্দরের সার্থক উপাসক হিন্দু তার সাধনলব্ধ দিব্য চেতনার অত্যুন্নত স্তরে উঠে যে বিশুদ্ধ রুচিবোধ ও সৌন্দর্যবোধের অধিকারী হয়েছিল, ভারতের প্রবর্ত্তিত শিল্পকলায় তারই সূক্ষতম ব্যঞ্জনা আমরা দেখতে পাই'। [৪৬]

Saifuddin Chowdhury তাঁর 'Aspects of Material and Folk culture in Bangladesh' গ্রন্থে লিখেছেন—"The utensils that are found to be relieved on terracotta panels not only throw a light on the different professonal craftsman such as potters, basket makers, blacksmiths, metal carvers, gold smiths and Jewellers but at the same time they also reveal the artistic excellence attained by some such crafts men as well." (৪৭)

বাটা - "বাংলার পল্লী, দরিদ্র পল্লী—এইভাবে (গৃহ শিল্প সামগ্রীর উপকরণে) ভরপুর প্রেমের তপস্যায় শিল্পসমৃদ্ধ ছিল। এইজন্য বাংলার প্রত্যেক গৃহস্থের মন এত সরস ও প্রেমপূর্ণ ছিল"- দীনেশচন্দ্র সেন।

সেকালের গৃহশিল্প সামগ্রীতে বাঙালি পল্লী রমণীর কোমল হাতের স্পর্শ ছিল। তাদের ছিল স্নেহ পরায়ণ হৃদয়। বাটায় পান রাখা হত। ডোকরা কামারদের তৈরি কাঁসা-পিতলের বাটা ঘরের কোণে শোভা পেত। পানের বাটার গায়ে নানা কারুকার্য খচিত চিত্র অলংকার শোভা পেত। ফুল-পাতার নকসা বাটার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করত। এভাবেই বাঙালির ব্যবহারিক প্রয়োজনে এসেছিল শিল্পের ছোঁয়া। সৌন্দর্য সন্ধানী হৃদয় স্পর্শে সাধারণ তুচ্ছাতিতুচ্ছ উপকরণে রঙীন হয়ে উঠত বাঙালির গৃহকোণ। বাটার গায়ে ডোকরা কামারেরা আঁকতেন ময়ূর, মাছ প্রভৃতি শিল্পকর্ম।

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে বাটার উল্লেখ এসেছে। গুজরাট নগরে কাঁসারিরা বসেছেন। শাল পেতেছেন। ঘটি, বাটি এবং বাটা গড়ছেন। --

"সাঁপুড়া চুনাতি বাটা উরমাল ঘাঘর ঘাঁটা

সিংহাসন গড়ে পঞ্চদীপ"। (৪৮)

বণিকখণ্ডে বাটার ব্যবহার এসেছে। ফাল্গুন মাস। খুল্লনার বিবাহ আয়োজন। বাটায় মঙ্গল আয়োজন থরে থরে সাজানো—

"পাট ভর‍্যা নিল খই ঘড়া ভরা ঘৃত দই

সাজিআ সুরঙ্গ নিল বাটা"। [৪৯]

বিবাহের মঙ্গল উৎসবে নানা আয়োজন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ঐতিহ্য সূত্রে বাঙালি সমাজ এমন মঙ্গল অনুষ্ঠান পালন করে এসেছে। এমন শুভ অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

"চন্দন কুসুম কেহ বাটা ভরা কড়ি"। [৫০]

কিংবা—

"চন্দন কুসুম দুর্বা বাটা ভর্যা কড়ি"। [৫১]

এমন শুভ অনুষ্ঠান কেবল উদর স্ফূর্তি নয়, কেবল আচার সর্বস্বতা নয়, এর সঙ্গে যুক্ত কল্যাণ চিহ্ন। বাঙালির সংসার জীবনে এমন অনুষ্ঠান সৌন্দর্য লক্ষ্মীর পূজা। ধনপতি দত্তের শয়ন ঘরেও বাটায় সাজানো থাকে পান, সুগন্ধি চন্দন, আর কর্পূর—

"বাটা র‍্যা পান গুয়া সুগন্ধি চন্দন চুয়া

কর্পূর লবঙ্গ তোলা লেখা"। [৫২]

প্রজন্ম অতিক্রান্ত হয়। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের রীতি-নীতি একই রকম থাকে। আবার শ্রীমন্তের বিবাহ উৎসব। দোলায় চেপে বর কনে চলছেন। কবিকঙ্কণ বাঙালির আচার সংস্কারের কথা ভোলেন নি। লিখেছেন—

"চন্দন কুসুম দুর্বা বাটাভরা কড়ি"। [৫৩]

বাঙালির দৈনন্দিন ব্যবহার্য শিল্পকলা বাঙালি সংস্কৃতির ভাণ্ডার ঘর। সরল পল্লী রমণীদের ব্যবহার্য শিল্পকলা আজ হারিয়ে যাওয়ার বস্তু। তারাপদ সাঁতরা তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পীসমাজ' গ্রন্থে যথার্থই লিখেছেন— "বঙ্গ সংস্কৃতির ভাণ্ডার আজ তাই শুষ্ক। প্রচলিত রূপের জগৎ আর তার শিল্প চেতনা আজ মৃতপ্রায়। বঙ্গ সংস্কৃতির এইসব অমূল্য উপকরণ আজ তাই স্থানান্তরিত হয়েছে মিউজিয়ামের বদ্ধ খুপরির মধ্যে। [.....] দীর্ঘশ্বাস পড়লেও এরকম একাধিক গ্রামীণ গৃহশিল্পসামগ্রীর অপমৃত্যু আমাদের বোধ করি সহ্য করতেই হবে"। [৫৪]

পানপাত্র বা বাটার ব্যবহার প্রাচীন কাল থেকেই পাওয়া যায়। স্বর্গে দেবকন্যারা ইন্দ্রের জন্য পানপাত্র পাঠাতেন। বরুণ দেব ব্যবহার করতেন পানপাত্র। দেবকন্যারা ক্ষীরোদ সমুদ্রে বরুণের ব্যবহৃত একটি পানপাত্র যুধিষ্ঠিরকে উপহার স্বরূপ পাঠিয়েছিলেন--

"যথৈব মধু শক্রায় ধারয়ন্ত্যমরস্ত্রিয়ঃ।

তদস্মৈ কাংস্যমাহার্ষীদ্বারুণং কলশোদধিঃ" ।।২৬।। [৫৫]

হিন্দুদের ধর্মীয় সংস্কার, রীতি-নীতি, বিশ্বাসের প্রতিফলন বিভিন্ন তৈজসপত্র, এবং ব্যবহৃত জিনিসপত্রে লক্ষ করা যায়। ভারতবর্ষ প্রাচীন সভ্যতার ধাত্রী। আর্য-অনার্য, হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান-জৈন-শিখ-পারসিক প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের দেশ এই ভারতবর্ষ। হিন্দু বাঙালি লক্ষ্মীপূজোয় লক্ষ্মীর পায়ের মোটিফ অঙ্কন করেন। মুসলমান ধর্মের মানুষ জায়নমাজ এবং কোরাণ পড়ার টুপিতে অঙ্কন করেন বিভিন্ন মোটিফ। হিন্দুর গঙ্গাজল রাখার লোটাতে মোটিফ হয় আলাদা। ধর্মীয় ভাবনা, রীতি-নীতি এবং আচরণগত পার্থক্যের কারণে অলংকরণ এবং মোটিফের পার্থক্য থাকলেও সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনপ্রবাহ এবং ঈশ্বরভাবনার মূল সুর একই। Ananda k. Coomaraswamy তাঁর 'History of Indian and lndonesian Art' গ্রন্থে লিখেছেন—

"Brass and to a less extent copper are widely used amongst Hindus for domestic utensils and ceremonial implements. The commonest from is the small water vessel known as the 'lota', [.....] and often decorated with engraved designs. [.....] a very long neck used for carrying Ganges water. [.....] and personal ritual are found in an endless variety of fine and sometimes elaborately decorated forms. [৫৬]

ডোকরা কামারেরা পিতল দিয়ে থালা-বাটি-গ্লাসের শিল্পকাজ করেন। পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি জেলার বিস্তৃত অঞ্চলে ডোকরা

কামারদের দেখা মেলে। কমলকুমার মজুমদার তাঁর "বঙ্গীয় শিল্পধারা ও অন্যান্য প্রবন্ধ" গ্রন্থে ডোকরা কামারদের শিল্প সৃষ্টি প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"আগুন ধরিয়ে তাদের স্বরচিত ছাগলের চামড়ার হাপর দিয়ে খুব বাতাস দিতে থাকে। [.....] আগুন যখন গনগনে, পিতল গলে ক্ষীর, এরা নুনের ছিটে দেয়, সোহাগা দেয়। তারপর সেই মাটি-বন্ধ পিতলের ছাঁচটি আগুনে ধরে মোমটি গালিয়ে নালি দিয়ে বার করে নেয়। মোম বার হয়ে গেলে দু পায়ে চেপে ধরে পিতল ঢালে। মূর্তিগুলো নরুন দিয়ে জট মারে, চিকন করে। তারপর গুন গুন করে গাইতে গাইতে গৃহস্থদের জিনিস বুঝিয়ে দেয়"। (৫৬)(ক)

এখনও পানের ব্যবহার আছে। পান খাওয়ার সংস্কৃতি এখনও বেঁচে আছে। কিন্তু পান বিলাসের সঙ্গে সঙ্গে পানের বাটা, পানের সাজ আজ আর নেই। বাঙালিকে এক বিষণ্ন উদাসীনতা ভর করে। প্রবালকান্তি হাজরা তাঁর "গ্রামীণ সংস্কৃতির ঝাঁপি" গ্রন্থের 'ঐতিহ্যের বিষণ্ন স্মৃতি - পানবাটার সাজ' প্রবন্ধে লিখেছেন— "এক সময় রাজা-বাদশার দরবার থেকে সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে পানের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হওয়ায় গড়ে উঠেছিল পান সাজার জন্য বাটা ও আনুষঙ্গিক সাজ'। এগুলি তৈরির কারিগর ও তাদের দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত। বর্তমানে আধুনিকতার জোয়ারে সেসব সাজের দিন গেছে, কিন্তু পানের ব্যবহার কমে নি। [.....] পান ও পানবাটাসহ সেই অতীত সময়ের স্মৃতি এখন বয়স্ক-বয়স্কাদের বিষণ্ন করে তোলে"।(৫৭)

থালা- থালা দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য অংশ। নিত্যদিনের নানা কাজে থালা ব্যবহৃত হয়।থালা মূলত ধাতু দিয়ে তৈরি। লোহা-কাঁসা-পিতল-সোনা প্রভৃতি উপাদানে থালা তৈরী হয়। H.H.Risley তাঁর 'The Tribes and Castes of Bengal' গ্রন্থে লিখেছেন-

"The Kamars or Karmakars of Bengal are popularly believed to be descended from on intrigue between a women of the Sudra Caste and the celestial artificer Viswa-Karma."(৫৮)

কবিকঙ্কণের কাব্যে নানা ধাতু বা ভিন্ন উপকরণে তৈরি থালার উল্লেখ আছে। একশ্রেণীর কামার সব রকমের ধাতুর কাজ করেন না। ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকার সূত্রে এক এক রকমের ধাতুর কাজ করতে এক এক সম্প্রদায়ের কামার দক্ষতা অর্জন করেন। মেদিনীপুর জেলার কামারদের পরিচয় দিতে গিয়ে H.H.Risley তাঁর – 'The Tribes and Castes of Bengal'গ্রন্থে লিখেছেন –

Lohar kamars, who work in iron; (2) Pintule-kamars,who make brass utensils; (3) Kansaris, who work in bell-metal;[.....] (6) Chanda kamars, whose speciality is the manufacture of brass mirrors. (৫৯)

কবিকঙ্কণের কাব্যের নানা স্থানে থালার উল্লেখ এসেছে। নিম্নলিখিত ভাবে কবির কাব্যে থালা এসেছে- ১) থাল (থালা পৃঃ২৫), ২) থালা (পৃঃ৮২), ৩) থালা(পৃঃ৮৭), ৪)কনকথালা (পৃঃ১১৯), ৫) হেমথালা (পৃঃ১২০), ৬) থালা (পৃঃ১২৫) ৭) হেমথালা (পৃঃ১৩১), ৮)থালা (পৃঃ১৪৭), ৯) হেমথাল(পৃঃ১৫০), ১০) হেমথাল (পৃঃ১৯৭), ১১) থালা (পৃঃ২১৬), ১২) থালা (পৃঃ২৭৬), ১৩) থালা (পৃঃ৩০৩)।

[উপরিলিখিত লোকশিল্পের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি তথ্যসূচীতে উল্লিখিত গ্রন্থে নির্দিষ্ট।(৬০)]

আখেটিক খণ্ডে ভিক্ষারত শিবের চিত্র অঙ্কন করেছেন কবি। গৃহস্থ কোঁচ রমণী শিবকে থালায় রাখা ভিক্ষার চাল তুলে দিচ্ছেন।এমন থালা সাধারণ থালা।কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

"ভ্রমেন উজানি ভাটি চৌদিকে কোঁচের বাটী

কোঁচ- বধূ ভিক্ষা দেই থালে

থাল হইতে চালগুলি পুরিআ এড়েন ঝুলি

দ্বাদশ লম্বিত ঝুলি দোলে"। (৬১)

গুজরাট নগর পত্তনের সময়ে অন্যান্য বৃত্তিজীবী শিল্পীদের সঙ্গে এসেছেন কাঁসারিরা। কাঁসারিরা কাঁসায় থালা তৈরি করেছেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন----

"কাঁসারি পাতিআ শাল ঝারি খুরি গড়ে থাল

বাটী ঘটী বট লই শিপ"।[৬২]

বণিকখণ্ডে অবশ্য দেবপূজার জন্য লহনা সোনার থালা ব্যবহার করেছেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

"নৈবিদ্য নানা বিধি খণ্ড মধু দধি

শর্করা পুরি হেম থাল"। [৬৩]

আখেটিক খণ্ডে যেখানে ফুল্লরা সামান্য মাটির পাত্রে খাদ্য গ্রহণ করছেন, সেখানে বণিকখণ্ডে অন্তঃপুরচারী অভিজাত রমণীরা দেবপূজায়, উৎসব অনুষ্ঠানে সোনার থালা ব্যবহার করছেন। সমাজের অন্তর্গত উচ্চ- নীচ ভেদাভেদ, ব্রাত্য অপাংক্তেয় নিরন্ন মানুষের কোন ক্রমে বেঁচে বর্তে থাকা, অসম বৈপরীত্যের নিখুঁত কাব্যময় চিত্র চিরকালের পাঠককে উপহার দিয়েছেন কবিকঙ্কণ।

থালা, বাটি, ঘটি এসব তৈজসপত্র বাঙালির গৃহকোণকে আলোকিত করে তোলে। অপরূপ দৃশ্যময় সৌন্দর্যরাশির সমাহার যেন। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'গৃহকোণ' প্রবন্ধে লিখেছেন –"এই পুকুরপাড়ে ঘাটের ধাপে আম্রকুঞ্জ ও বাঁশঝাড়ের ছায়ায় আমাদের চিরহাস্যময়ী গ্রাম্য বধূর নিত্য রঙ্গভূমি। প্রতি দিন প্রভাতে ঐখানে ঘাটের চাতালটিতে বসিয়া তিনি রাশীকৃত তৈজসপত্র মার্জ্জন ঘর্ষণ ও পরিষ্করণে নিযুক্ত থাকেন। কত রকমের থালী, কত রকমের বাটি, কত বিচিত্র গঠনের ঘটি, — কাঞ্চননগরী, গয়েশ্বরী, জগন্নাথী, বলেশ্বরী, খাগড়াই, পশ্চিমী, দক্ষিণী, কত গঠন এবং কারুকার্য্য, কত আকার এবং প্রকার,কত কলানৈপুণ্য ও সূক্ষ্ম কৌশল।[.....]এবং গৃহের বধূকে প্রতিদিন এইগুলি মাজিয়া ঘষিয়া তক্‌তকে করিয়া রাখিতে হয়"।[৬৪]

গৃহস্থালী শিল্পের এমন সৌন্দর্য অনুভবের বিষয়। সংসার এবং সমাজের মঙ্গল, পরিশীলিত জীবনবোধ সাধারণ গৃহস্থালী শিল্পেও ফুটে ওঠে। মধ্যযুগের বাঙালি সাধারণ শিল্পে এমন রুচির ছাপ এনেছিলেন।

সোনার গাড়ু ও সোনার কলস- স্বর্ণকারেরা সোনার কলস এবং সোনার গাড়ু তৈরি করেন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আখেটিক খণ্ডে সোনার কলসের উল্লেখ আছে। কালকেতুর নির্মিত গুজরাট নগরে গৃহের উপরিভাগে সোনার কলসের চূড়ায় নেতের পতাকা উড়ছে। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

"কনককলস চূড়ে নেতের পতাকা উড়ে

গৃহশিরে শোভে সুদর্শন"। (৬৫)

বণিকখণ্ডে সোনার গাড়ুর উল্লেখ আছে।সেকালে অভিজাত বণিকদের অন্তঃপুরে সোনার গাড়ুতে ঘি থাকত। বণিক রমণী লহনা সোনার গাড়ুতে ঘি রেখেছেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম লিখেছেন-

"সুবর্ণের গাড়ুতে লহনা দেই ঘি।

হাসিআ পরসে রামা বাণিঞার ঝি"।(৬৬)

অভিজাত বণিক কন্যা সোনার গাড়ুতে ঘি রেখেছেন। এই গাড়ু স্বর্ণকারেরা তৈরি করেন। আর গুজরাট নগরে যে মন্দির তৈরি হয়েছে, সেই মন্দিরে কলসের চূড়ায় পতাকার পতপৎ করে ওড়া প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় পুরাণ ভাবনাকে চিহ্নিত করে।সেকালে অভীষ্ট ফল লাভের জন্য শিবের মন্দিরে ঘট প্রতিস্থাপিত হত।সেই ঘটে শিব এবং দুর্গার মূর্তি চিত্রিত করে পূজা করা হত। শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ তাঁর 'স্মৃতি চিন্তামণি:'- গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন-'শিবদুর্গামূর্ত্তিচিত্রণে বিহিতেহপি শালগ্রামাদৌ পূজানাচারঃ'।(৬৭)

রমণীরা ব্রত পালনের সময় (ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমীতে) শিব দুর্গার মূর্তি চিত্রিত করে পূজা করেন। সাধারণত ঘটে পৌরাণিক চিত্র অঙ্কন করে পূজা করার এমন রীতি প্রচলিত।

মধ্যযুগের অস্ত্র-শস্ত্র

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে যে সমস্ত অস্ত্রের উল্লেখ আছে, সেগুলির মধ্যে প্রধান হল তির, টাঙ্গি, ধনুক, বাটুল, কামান, ত্রিশূল, পট্টিশ, বাণ, খড়্গ (খাড়া), কবচ প্রভৃতি। এছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মরক্ষার্থে ব্যবহৃত বর্মও কবিকঙ্কণের কাব্যে এসেছে। চণ্ডীমঙ্গলে তির এবং ধনুক অনার্য অস্ত্র রূপেই পরিগণিত। Heinrich Zimmer তাঁর 'Myths and Symbols in Indian Art and Civilization' গ্রন্থে লিখেছেন –" The Vedic tradition, was in olden time a huntsman, and he was armed with a bow and arrow."(৬৮)

ধনুক- পরবর্তীকালে আর্যসভ্যতার প্রাধান্যের যুগে তির- ধনুক প্রধান অস্ত্ররূপে বিবেচিত হয়। George C.M.Birdwood তাঁর "The Arts of India" গ্রন্থের 'Arms' অধ্যায়ে লিখেছেন – "In the Rig-Veda frequent allusion is made to the use of the bow, the mastery of which was considered so important that a supplementary Veda, the Dhanur Veda, is devoted to it.In the Ramayana, Rama wins Sita for his bride by bending the great bow of Siva; and in the Mahabharata the choice of Draupadi fell on Arjuna for his skill in archerery."(৬৯)

কবিকঙ্কণের কাব্যের আখেটিক খণ্ডে অনার্য অস্ট্রিক অস্ত্ররূপে এসেছে ধনুক। ধনুকের উল্লেখ কাব্যে এসেছে নিম্নলিখিত রূপে –১) কাঠের ধনুক (পৃ: ৪৬) ২) ধনুক (পৃ: ৪৮-২বার উল্লিখিত) ৩) ধনুক (পৃ: ৫৪-২বার উল্লিখিত) ।

[উপরিউক্ত লোকশিল্পের পৃষ্ঠা সংখ্যাগুলি তথ্যসূচিতে উল্লিখিত গ্রন্থে নির্দিষ্ট](৭০)

কালকেতু পশুদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন মূলত তির ধনুক নিয়ে –

"একা মহাবীর লই তিন তির

কুলিতা কাঠের ধনু"।(৭১)

কালকেতু সিংহকে ধনুকের বাড়ি দিয়ে প্রহার করছেন –

"পাছু মহাবীর মারে ধনুকের বাড়ি

ধনুকের বাড়ি খাইআ সিংহ নাঞি ফিরে"। (৭২)

আবার ধনুকের হুলে কালকেতু গোধিকা বেঁধে নিয়ে চলেছেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

"ধনুকের হুলে হেম-গোধিকা বান্ধিয়া

ঘরেরে চলিল বীর বিষাদ ভাবিআ"। (৭৩)

সেকালে ব্যাধ সন্তান কালকেতুর হাতে ধনু তুলে দেওয়ার জন্য সামাজিক রীতি এবং সংস্কারের উল্লেখ করেছেন কবিকঙ্কণ –

"গণক আসিঞা ঘরে শুভদিন শুভবারে

ধনু দিল ব্যাধসুত করে"। (৭৪)

দেবতাদের ব্যবহৃত ধনুক তাদের শক্তির উৎস । পুরাণ এবং অলৌকিকতা ধনুকের উপর আরোপ করেছেন শাস্ত্রকারেরা। শিবের ধনুক বিষয়ে J.E.Cirlot তাঁর "A Dictionary of Symbols" গ্রন্থে লিখেছেন –"Shiva's bow is, like the lingam, the emblem of the god's power".(৭৫)

বাটুল- বাটুল হল চামড়া কাঠ দিয়ে তৈরি। বাটুল লোহার তৈরি গুলি দিয়ে ছোড়া হয়। লোহার তৈরি গুলি ছুড়ে লক্ষ্য বস্তুকে আঘাত করা হয়। শিশু অবস্থাতেই কালকেতু বাটুল হাতে নিয়ে শিকার করতেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

"বিহঙ্গ বাটুলে বধে লতায় সাঁজুড়ি বাঁধে

কান্দে-ভারে কালু আইসে ঘরে"।(৭৬)

অনার্য কালকেতু সহজাতভাবেই শিকার আয়ত্ত করেছেন । এমন পরিবেশেই ছোটবেলা থেকে বড় হয়েছেন ।বাটুল দিয়ে পাখি শিকার করে তিনি লতা পাতায় বেঁধে বাড়ি নিয়ে আসেন। কবিকঙ্কণ আখেটিক খণ্ডে শিশুমনে শিকারী কালকেতুর পূর্ণাঙ্গ ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব)' গ্রন্থে লিখেছেন – "ঐ-সব ভূখণ্ডে (ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশ, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশ ও দ্বীপপুঞ্জ)

সর্বত্রই অস্ট্রিক ভাষার প্রচলন ছিল...ইহারা প্রায় সকলেই আদি – অষ্ট্রেলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত , যেমন মুণ্ডা, কোল ও সাঁওতালেরা, ভূমিজ ও শবরেরা, মালয় ও আনাম অঞ্চলের অধিবাসীরা, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের লোকেরা। (৭৭)

কামান- মধ্যযুগে ব্যবহৃত কামান কেমন ছিল, তার পূর্ণাঙ্গ রূপ আজ হয়তো পাওয়া যাবে না । কামান অর্থাৎ তোপ। একপ্রকার গোলা নিক্ষেপক লৌহ যন্ত্র হল কামান । মধ্যযুগে এক সম্প্রদায়ের মানুষ কামান তৈরি করা এবং বসানোর কাজ করতেন ।এদের বলা হত কামানিঞা । কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আখেটিক খণ্ডে কামানের ব্যবহার আছে। কালকেতু এবং কলিঙ্গ রাজের যুদ্ধে কামান ব্যবহৃত হয়েছে । কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

"কামানিঞা কামান পাতিল থরেথরে

তালফল সম গোলা পেলিল ভিতরে"।(৭৮)

আবার শ্রীমন্তের সঙ্গে সিংহল রাজের যুদ্ধেও কামানের ব্যবহার হয়েছে । কবিকঙ্কণের ভাষায় –

"চোঙর ভোঙর মাথে কৃপান কামান হাথে

কত কত সমরপণ্ডিত"। (৭৯)

বণিকখণ্ডে শ্রীমন্তের সঙ্গে সিংহলদেশের যুদ্ধে কামান সজ্জার কথা লিখেছেন কবিকঙ্কণ–

"বিষম তবলে ঘন আরোপিত্র কাটি

গুরুজ কামান হাতে শেল পাটী পাটী" ।(৮০)

মধ্যযুগের বাঙালির হাতের এমন যুদ্ধাস্ত্রের প্রকৃত রূপ এবং তার ব্যবহার কেমন ছিল, তা সঠিক ভাবে বোঝার উপায় নেই । কিন্তু কামানের উল্লেখ এবং ব্যবহার ছিল।একটি যুগকে পিছনে ফেলে এসেছি আমরা।

খড়্গ, খাড়া- প্রাচীন কালের যুদ্ধাস্ত্র হল খড়্গ । খড়্গের উল্লেখ সমস্ত মধ্যযুগের সাহিত্যে এসেছে । কবিকঙ্কণের কাব্যে খড়্গের উল্লেখ এসেছে ।কালকেতু অরণ্যে

চামরির লেজ কেটে নেন । ফুল্লরা হাটে চামর বেচেন । মহিষের সিং উপড়ে নেন । সেই সিং থেকে তৈরি সিঙ্গা ফুল্লরা বেচেন সিঙ্গাদারকে । আর কেলকেতু বাঘকে হত্যা করেন। বাঘনখ ও বাঘছাল হাটে বিক্রি করেন ফুল্লরা । এভাবেই অরণ্যে গণ্ডার বধ করেন কালকেতু । ফুল্লরা হাটে খড়্গ বেচেন । সজ্জন ব্রাহ্মণ তর্পণ করার জন্য খড়্গ কেনেন । কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

"গণ্ডক বধিয়া কাণ্ডে খড়্গবলে ছিণ্ডে।

ফুল্লরা বেচয়ে খড়্গ দরে এক পণ

ব্রাহ্মণ সজ্জন লয় করিতে তর্পণ"। (৮১)

কালকেতুর হাতের খড়্গো পশুরা ভীত। মৃত্যুর প্রহর গোনে –

"খড়্গোর জ্বালায় মোর মইল দুটি ভাই"। (৮২)

মৃত্যু নিশ্চিত করতে বীরের হাতের খড়্গ ছিল নিশ্চিত অস্ত্র -

"খড়্গোতে কাটিয়া তোরে করিব দুই চির" । (৮৩)

কালকেতু বন কাটছেন। বাঘের কোপে পড়েছেন তিনি । বাঘের দাঁত মাঘ মাসের মুলার মতন। জিভ খড়্গোর সমান । কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

"বিকট দশনগুলা মাঘমাস্যা জেন মূলা

জুভাখান খাণ্ডার সমান"। (৮৪)

কামারেরা লোহা পুড়িয়ে খড়্গ তৈরি করেন । প্রাচীন অস্ত্র রূপে খড়্গ সুবিদিত।আরণ্যক হিংস্র পশুর সঙ্গে যুঝতে এই খড়্গোর জুড়ি নেই। খড়্গোর সাহিত্যিক ব্যঞ্জনা নিয়ে এসেছেন কবিকঙ্কণ । বাঘের জ্বিহাকে খড়্গোর সমান বলে উল্লেখ করেছেন কবি।

শেল- শেল প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্র । শেল হল 'সুক্ষ্মগ্র আয়ুধবিশেষ' । শেল লোহার তৈরি । রামায়ণে লক্ষ্মণের শক্তিশেলে পতন প্রবাদ রূপে বিবেচিত। এছাড়া ময়দানবের শেলের

উল্লেখ পাওয়া যায় । কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বণিকখণ্ডে শেলের উল্লেখ এসেছে। শ্রীমন্তের সঙ্গে সিংহল রাজের যুদ্ধের বর্ণনায় এসেছে শেল–

"করে ধরি সাঙ্গী ধায় রণরঙ্গী

তোমর টাঙ্গি শেল"।[৮৫]

কিংবা –

"শেল সাঙ্গী কাঁড় খাণ্ডা পাইকের জতেক ভাণ্ডা

সকল করিলি বুড়ি নাশ" । [৮৬]

কিংবা –

"কাঁড় খাণ্ডা শেল ভাঙ্গে"।[৮৭]

মধ্যযুগের সমস্ত সাহিত্যে শেলের বহুল ব্যবহার। শেল ভয়ঙ্কর অস্ত্ররূপে সুবিদিত। বাঙালি বীর সৈনিক নানা যুদ্ধে পরাক্রম দেখিয়েছেন। শ্রীমন্তও যুদ্ধক্ষেত্রে শেলের সাহায্যে তাঁর বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন।

শূল, ত্রিশূল - শূল শিবের অস্ত্র। "Myths and Symbols in Indian Art and Civilization" গ্রন্থে Heinrich Zimmer বলেছেন –" Shiva was regarded as the lord of the forest, the master of the animals of the wilderness. Wandering among these with his primitive weapon , he stood as their anthropomorphic patron." [৮৮]

শূলকে শিবের কোষ বা ঐশ্বর্য ভাণ্ডার বলা হয় । স্বামী নির্ম্মলানন্দ তাঁর "দেবদেবী ও তাঁদের বাহন" গ্রন্থে লিখেছেন – " শিবের আয়ুধ ত্রিশূল। শিব ত্রিশূলী। [.....] ত্রিশূল কেবল আয়ুধ বিশেষ নহে , এটিকে শাস্ত্রে বলা হয়েছে শিবকোষের কুঞ্জিকা বা চাবিকাঠি স্বরূপ।" [৮৯]

শূল লোহার তৈরি । কামার সম্প্রদায় শূল তৈরি করেন । এমন প্রাচীন অস্ত্রে পৌরাণিক মহিমা আরোপ করা হয়েছে । দক্ষযজ্ঞ নাশের সময়ে শিবের জটা থেকে জন্ম নিয়েছিলেন বীরভদ্র । বীরভদ্রের হাতে শিবশূল। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

"শূল হাথে কৃতাঞ্জলি রহিলা সমুখে ।

নয়ানে নিকলে অগ্নি ঝলকে ঝলকে"।[৯০]

বণিকখণ্ডে দেবী চণ্ডীকার রণরঙ্গিণী মূর্তি । তিনি যুদ্ধ করছেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম লিখেছেন –

"কাত্যায়নী তীক্ষ্ম বাণ কাছেন সত্বর

ত্রিশূল পট্টিশ সাঙ্গি শূল যমধর" । [৯১]

শিব এবং কৃষ্ণ এই দুই দেবতা ভারতীয় হিন্দু দেববাদ এবং মিথোলজির প্রধান অংশ । অস্ত্রের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে পুরাণ প্রবণতার অনুষঙ্গ জড়িয়ে আছে ।লোহা অস্ত্রের প্রধান উপকরণ। কামারেরা লোহা দিয়ে অস্ত্র তৈরি করেন ।সমস্ত শিল্পীদের দেবতা হলেন বিশ্বকর্মা । শিবের সঙ্গে ত্রিশূলের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য । দেবী চণ্ডিকাও যুদ্ধক্ষেত্রে ত্রিশূল ব্যবহার করেন। পৌরাণিক দেবদেবীর অস্ত্রকে কবিকঙ্কণ তাঁর কাব্যে সাহিত্যরূপ দিয়েছেন।

পট্টিশ- পট্টিশ মধ্যযুগের ব্যবহৃত অস্ত্র । হরিচরণ বন্দোপাধ্যায় 'পট্টিশ' সম্পর্কে তাঁর অভিধান গ্রন্থ 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' – এ লিখেছেন –

"বক্ষঃস্থলসমান বা হস্ত প্রমাণ দ্বিমুখ অস্ত্রবিশেষ" ।[৯২]

পশুদের সঙ্গে যুদ্ধে কালকেতু পট্টিশের ব্যবহার করেছেন । কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

"ঘন তোলা দেই গোঁফে পেলিয়া পট্টিশ লোফে

আগলয়ে সিংহের সরণি"। [৯৩]

পশুদের সঙ্গে যুদ্ধে কালকেতু বিক্রম প্রকাশ করেছেন, ব্যবহার করেছেন পট্টিশ। মধ্যযুগের সাহিত্যে পট্টিশের উল্লেখ অনেক। কিন্তু একালে সাহিত্যের পাতা ছাড়া আর কোথাও এমন অস্ত্রের সন্ধান মেলে না ।

কাঁড়, কাঁড়া- মধ্যযুগে ব্যবহৃত এক ধরনের লৌহ অস্ত্র হল কাঁড় বা কাঁড়া, যা বাণ বা তীরের মত। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বণিকখণ্ডে শ্রীমন্তের সঙ্গে কলিঙ্গ রাজের যুদ্ধে কাঁড় এবং কাঁড়ার ব্যবহারের উল্লেখ আছে। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

"পুরিআ বেলকি ধাইল ধানকী

বাছিআ মারিতে কাঁড়া"।(৯৪)

ব্রাহ্মণী জরতী বুড়ি বেশধারী চণ্ডী এমন অস্ত্রকে মন্ত্রবলে প্রতিহত করেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

"শেল সাঙ্গী কাঁড় খাণ্ডা পাইকের জতেক ভাণ্ডা

সকল করিলি বুড়ি নাশ"।(৯৫)

বাংলাদেশ তান্ত্রিকের দেশ। অলৌকিক শক্তির দেশ। ব্রাহ্মণী জরতী বুড়ি এমন অলৌকিক শক্তির দ্বারা কঠিন অস্ত্রকে প্রতিহত করেন। মধ্যযুগের সাহিত্যে যুদ্ধক্ষেত্রে অলৌকিক শক্তির দ্বারা শত্রুপক্ষকে পরাজিত করার নানা উল্লেখ রয়েছে। কবিকঙ্কণের কাব্যে মন্ত্রশক্তির প্রয়োগে ভীষণ অস্ত্রকে পরাভূত করার ছবি উল্লিখিত।

মুদ্গর- মধ্যযুগের সাহিত্যে উল্লিখিত অস্ত্র মুদ্গর । মুদ্গর প্রাচীনকালের যুদ্ধাস্ত্র । মুদ্গর সম্পর্কে হরিচরণ বন্দোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' গ্রন্থে লিখেছেন – 'লৌহময় আয়ুধবিশেষ'।(৯৬)

কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মুদ্গরের উল্লেখ এসেছে । আখেটিক খণ্ডে কালকেতুর সঙ্গে যুদ্ধে অনেক সেনার মৃত্যু হয়েছে । কিন্তু যুদ্ধ অবসানে মন্ত্রিত কুশজলে সেনাপতিরা প্রাণ ফিরে পেয়েছেন । কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

"পাইআ কুশজল উঠিল গজবল

লোহার মুদ্গার শুণ্ডে"।[৯৭]

বণিকখণ্ডেও সিংহল নগরীতে মৃত সৈনিকেরা দেবী চণ্ডীর কৃপায় ঔষধে প্রাণ ফিরে পেয়েছিলো । কবিকঙ্কণের ভাষায় –

"জলবিন্দু দিল চণ্ডী গজবল মুণ্ডে

জিআ উঠে মৃত্যুহস্তি মুদ্গার লয়্যা শুণ্ডে"।[৯৮]

বাল্মীকি রামায়ণে লঙ্কাপুরী রক্ষার জন্য রাক্ষসেরা শূল এবং মুদ্গার হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন।তারা পর্যায়ক্রমে বিশ্রাম নিতেন।মহাকবি বাল্মীকি লিখেছেন –

"শূলমুদ্গারহস্তাংশ্চ শক্তিতোমরধারিণঃ

দদর্শ বিবিধান্ গুল্মাংস্তস্য রক্ষঃপতেগৃর্হে"। [৯৯]

মানুষ সংসার আসক্ত । শঙ্করাচার্য এমন মোহগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি মুদ্গার নিক্ষেপ করেছিলেন ।বিপরীতে এ সংসার বিমুখ বৈরাগ্যকে আঘাত করেছেন মোহিতলাল। 'বিস্মরণী' কাব্যের 'মোহমুদ্গার' কবিতায় কবির বলিষ্ঠ জীবন দর্শন প্রকাশিত –

"এই চির সুন্দরের রূপ-হর্ম্যে ফিরিব আবার

কক্ষে কক্ষে সবিস্ময়ে খুলিব কি ইন্দ্রিয় দুয়ার"।[১০০]

বাণ /শর- প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্র হল বাণ বা শর । ধনুকের সঙ্গে বাণ ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। ধনুক এবং শর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অস্ত্ররূপে পরিগণিত । রামায়ণ- মহাভারত অনেকটা বাণের মহাকাব্য । এক এক বাণের এক এক নামকরণ এবং কাজ মহাকাব্যে পরিলক্ষিত হয় । বাণের ক্ষমতা মহাকাব্যে অলৌকিক বিস্ময়ের জন্ম দিয়েছে । মহাকাব্যের নায়ক এবং শ্রেষ্ঠ বীরেরা বাণেই তাদের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন ।আরণ্যক অস্ট্রিক এবং সাঁওতাল জনজাতি সম্প্রদায় প্রাচীনকাল থেকে তির ধনুকের ব্যবহার করেছেন ।মহাভারতের একলব্য নিষাদ পুত্র ।চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আখেটিক খণ্ডে কালকেতু শিশুকাল থেকে অস্ত্রশিক্ষা করেছেন –

"শরাসনে আকর্ণ পুরিত কৈল বাণ

হাথে শরে রহে কালু চিত্রনির্মাণ"।[১০১]

দেবী চণ্ডিকা যুদ্ধক্ষেত্রে বাণের ব্যবহার করেছেন –

"চণ্ডনাদ চণ্ডিকা ছাড়েন চণ্ডবাণে

.....

কাত্যায়নী তীক্ষ্ম বাণ কাছেন সত্বর" ।[১০২]

যুদ্ধক্ষেত্রে বাণ বৃষ্টির উল্লেখ করেছেন কবিকঙ্কণ –

"কার পিষ্ঠদেশেতে পূর্ণিত শোভে বাণ"।[১০৩]

কিংবা -

"বাণ বৃষ্টি করে জেন জল-বরিষণ"। [১০৪]

বৈদিক সাহিত্য, রামায়ণ, মহাভারত এবং মঙ্গলকাব্যে বাণের উল্লেখই সবচেয়ে বেশি । বাণ অন্যতম শ্রেষ্ঠ অস্ত্ররূপে পরিগণিত । ধনুর্ধারী যোদ্ধা শ্রেষ্ঠ যোদ্ধারূপে পরিগণিত হয়েছে রামায়ণ মহাভারতের যুগে । রামচন্দ্র, অর্জুন, কর্ণ, ভীষ্ম শ্রেষ্ঠ যোদ্ধারূপে স্বীকৃত। কবিকঙ্কণ যুদ্ধক্ষেত্রে বাণ বরিষণের পৌরাণিক অনুষঙ্গকে ফুটিয়ে তুলেছেন । কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী আর্য অনার্য দুই শ্রেণীর যোদ্ধার পরিচয় রেখেছেন তাঁর কাব্যে।

কবচ - কবচের উল্লেখ আছে ঋগ্বেদে –

"যদশ্বান্ধুষু পৃষতীরযুগধ্বং হিরণ্যয়াপ্রত্যৎকৃঅমুগধ্বং"।[১০৫]

কবচ এক ধরনের গাত্রাবরণ । কবচ লোহা প্রভৃতি ধাতু নির্মিত হত । প্রাচীনকালের যোদ্ধারা বক্ষে একরকম বর্ম ধারণ করতেন। বিরুদ্ধ আক্রমণ ও অস্ত্রাঘাত প্রতিহত করার জন্য যোদ্ধারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে এরকম বর্ম ধারণ করতেন । কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আখেটিক খণ্ডে কালকেতু কবচ ধারণ করেছেন । পশুরাজ সিংহ যুদ্ধক্ষেত্রে কালকেতুর কবচ ছিঁড়ে ফেলেছেন –

"সিংহ চাহে কোপদৃষ্টে বীরের আচড়ে পিষ্টে

কবচ করিল ছারখার"।[১০৬]

মহাভারতে কর্ণ যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন জন্ম মুহূর্তে তাঁর কানে দুটি কুণ্ডল ও শরীরে অভেদ্য কবচ ছিল । যার প্রভাবে কর্ণ-ছিলেন স্বর্গ লোকের মত সুন্দর এবং প্রভাত সূর্যের মত তেজস্বী । মহাভারতকার লিখেছেন –

"সকুন্ডলং সকবচং দেবগর্ভং শ্রিয়ান্বিতম্।

দিবাকরসমং দীপ্ত্যা চারুসর্ব্বাঙ্গভূষিতম্"।[১০৭]

তোমর - তোমর প্রাচীন লোক অস্ত্র। তোমর হস্ত নিক্ষিপ্ত দীর্ঘ দণ্ড অস্ত্র বিশেষ । তোমরের সম্মুখভাগ সুতীক্ষ্ণ । লৌহ নির্মিত এই অস্ত্র কামারেরা তৈরি করেন । শ্রীমন্তের সঙ্গে সিংহলরাজের যুদ্ধে তোমর ব্যবহৃত হয়েছে–

'করে ধরি সাঙ্গী ধায় রণরঙ্গী

তোমর টাঙ্গি শেল '।[১০৮]

বাঙালি যোদ্ধা শ্রীমন্ত সিংহলরাজের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন । বাংলা সাহিত্যে তোমরের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম । কবিকঙ্কণের কাব্যে লুপ্ত এই লোক অস্ত্রের উল্লেখ প্রাচীনকালের যুদ্ধ সজ্জার এক বিশিষ্ট রূপকে ফুটিয়ে তুলেছে ।

ঢাল - ঢাল যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত আঘাত রোধক ফলক । ঢাল লোহা বা ধাতু নির্মিত। প্রাচীন ও মধ্যযুগের যোদ্ধারা আত্মরক্ষার্থে ঢালের ব্যবহার করতেন । কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বণিকখণ্ডে ঢালের ব্যবহার আছে । যুদ্ধক্ষেত্রে ভীত পলায়নরত যোদ্ধারা ঢাল,খড়্গ, ফেলে চলে যাচ্ছেন । কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

"ঢাল খাণ্ডা পোলাইয়া পালায় পুরন্দর"।[১০৯]

ঢাল যারা ব্যবহার করেন, তাদের বলা হয় ঢালী । ঢালীরা ঢাল ধারী যোদ্ধা সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

"মাথায় সুরঙ্গ ডালি তবকী ধানকী ঢালি

পাইক আইসে কাহনে কাহনে"।[১১০]

বর্ম বা ঢাল রামায়ণ, মহাভারতের কালের যোদ্ধাদের রক্ষাকবচ । মঙ্গলকাব্যে ঢালের ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয় । ঢাল লৌহ নির্মিত। প্রাচীন কামারেরা যোদ্ধাদের জন্য লৌহনির্মিত ঢাল তৈরি করতেন । কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এমন ঢালের উল্লেখ মধ্যযুগের এক যুগ পরিমণ্ডলকে সামনে নিয়ে এসেছে –

ঋগ্বেদ সংহিতায় নানা অস্ত্রের উল্লেখ আছে । ঋগ্বেদের ৫ম মণ্ডলের ৫২ সূক্তে 'খৃষ্টী' অর্থাৎ আয়ুধ বিশেষ বা বিশেষ অস্ত্রের উল্লেখ তাৎপর্যপূর্ণ –

"আ রুক্মৈরা যুধা নর ঋষ্বা ঋষ্টীরসৃক্ষত"।[১১১]

ভারতবর্ষ প্রাচীন সভ্যতার উৎসভূমি । অনার্য মানুষের বাসভূমি । আর্য-অনার্যের সংঘাত-সমন্বয় এখানে স্বাভাবিক ছিল ।বহিঃশত্রুর আক্রমণ এবং যুদ্ধবিগ্রহ ছিল এখানে নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা । স্বাভাবিকভাবে প্রাচীনকাল থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে লোকায়ত মানুষ নানা অস্ত্র তৈরি করেছিলেন। এই অস্ত্রগুলি লোকশিল্প।

Saifuddin Chowdhury তাঁর 'Aspects of Material and Folk Culture in Bangladesh' গ্রন্থে "War weapons' সম্পর্কে লিখেছেন –

"They are shown wearing five hair pins in the shape of five miniature weapons viz. , ankusa, vajra, trisula, dhavaja and parasu . The same type of haripins are also found on the head of famous terracotta Yaksini of Tamluk in West Bengal".[১১২]

মানবসভ্যতার ইতিহাসে লোহা-তামা প্রভৃতি শিল্পের বয়স কয়েক হাজার বছর। ভারতবর্ষ প্রাচীন সভ্যতার ধাত্রী। মানুষের বহমান এমন শিল্পচর্চার সঙ্গে জড়িয়ে আছে সহস্র সহস্র শিল্পীর কর্মময় জীবনের কিংবদন্তী, শত শত জীবনের আখ্যান। সভ্যতা এগিয়ে চলেছে, রাজশক্তির উত্থান পতন হয়েছে। যুগে যুগে আর্য সামাজিক ব্যবস্থার বদল হয়েছে। কিন্তু শিল্পীরা থেকে গেছেন শিল্পী। একালে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির যুগে

হারিয়ে যাচ্ছে বাংলার প্রাচীন শিল্পীকুল কামারেরা। সেই পল্লীবাংলা আজ আর নেই। কামারের কামারশালে হাপরের শব্দ আজ আর শোনা যায় না। সেই ভ্রাম্যমান ডোকরা শিল্পীরা গেছে হারিয়ে। হারিয়ে গেছে তাদের মোমের ছাঁচের শিল্পকলা। দেবদেবীর মোটিফ সম্বলিত চিত্র একালে আজ স্মৃতির বস্তু। আর সেই বনেদি অভিজাত জমিদার গৃহিণী যারা ঘর-গেরস্থালীর উপকরণ রূপে ব্যবহার করতেন সোনার গাড়ু, সেই অতীত যুগের শিল্পকলা একান্তই আজ স্মৃতিকথা। একটা যুগকে পেছনে ফেলে এসেছি আমরা বিস্মৃত উপকথার মত।

তথ্যসূত্র:

১. H.H. Risley, The Tribes and Castes of Bengal, Calcutta, Printed at the Bengal Secretariat press 1892, Ethnographic Glossary, vol.-1, P. -388

২. সেনগুপ্ত, যতীন্দ্রনাথ, লোহার ব্যথা (কবিতা), মরুশিখা (কাব্যগ্রন্থ), যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতা সংকলন, সুনীলকান্তি সেন সম্পা., পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলি – ১৩, ১৯৯০, পৃ: ৩২

৩. Cirlot, J.E, A Dictionary of Symbols, Second Edition, Translated from the Spanish by Jack Sage, London, Routledge and Kegon Paul Ltd., 1962, Second Edition-1971, P.29

৪. Russell R.V, CPSIA information can be obtained at www.IcGtesting.Com Printed in the USA BVHWOIS0830231018, P. xxx

৫. দত্ত, রমেশচন্দ্র (অনূদিত ও সংকলিত), ঋগ্বেদ সংহিতা (মূল), ৫ মন্ডল, ৩০ সূক্ত, ।।১৫।।, নিমাই চন্দ্র পাল (সম্পা.), সদেশ প্রকাশনী, ২০০৭, পৃঃ ২৯১

৬. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃঃ ৬৭

৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৭

৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৮

৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৯

১০. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫১

১১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৯

১২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮১

১৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৯

১৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১২

১৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৬১

১৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৬৮

১৭. ঘোষ, ড. অনিলকুমার, গ্রামীণ শিল্পায়ন, প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৭, পৃঃ ৭৬

১৮. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃঃ ৬৪।

১৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭১

২০. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮১

২১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৮

২২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪৫

২৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮১

২৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৪

২৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৮

২৬. পূর্বোক্ত

২৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৬

২৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪১

২৯. সামাদ, আবদুস, বাংলার জনজাতি, বাকচর্চা, কলকাতা, ২০০৮, পৃঃ ৯২

৩০. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮১

৩১. Risley, Herbert Hope, The Tribes and Castes of Bengal, Calcutta, Printed at the Bengal Secretariat press, 1892, Ethnographic Glossary, Vol.1, P. 388

৩২. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন,নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃঃ ৮৬।

৩৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮২

৩৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২০

৩৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭৬

৩৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৮

৩৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬১

৩৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬১

৩৯. নির্ম্মলানন্দ, স্বামী, বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ, ভারত সেবাশ্রম সংঘ ২১১, কলকাতা, ১৪১৯, পৃঃ ৯০

৪০. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃঃ ৮২।

৪১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৬

৪২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৯

৪৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২১

৪৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫৪

৪৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭৬

৪৬. নির্ম্মলানন্দ, স্বামী, বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ, ভারত সেবাশ্রম সংঘ ২১১, কলকাতা, ১৪১৯, পৃঃ ৯০

৪৭. Chaudhury, Saifuddin, Bangla Academy, Dhaka, March, 2003, P.-36

৪৮. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃঃ ৮২।

৪৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২১

৫০. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৫

৫১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৫

৫২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬১

৫৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩০৪

৫৪. সাঁতরা, তারাপদ, পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পীসমাজ, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতিবিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ডিসেম্বর-২০০০, পৃঃ ৩৪

৫৫. সিদ্ধান্তবাগীশ, ভট্টাচার্য, শ্রীমদ্ হরিদাস (সম্পা.), মহাভারতম্, সভাপর্ব্ব, ৫, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৪০৩

৫৬. Coomaraswamy, Ananda K., History and Indian and Indonesian Art, London, Edward Goldston, 1927, Leipzig, Karl.W.Hiersemann, New York, E.WEYHE, PP. 135, 136

৫৬.(ক) মজুমদার, কমলকুমার, বঙ্গীয় শিল্পধারা ও অন্যান্য প্রবন্ধ, দীপায়ন, কলকাতা, ১৪০৫, পৃ: ৫৩, ৫৪

৫৭. হাজরা, প্রবালকান্তি, গ্রামীণ সংস্কৃতির ঝাঁপি, অর্পিতা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪১৬, পৃঃ ৪৯

৫৮. Risley, Herbert Hope, The Tribes and Castes of Bengal, Calcutta, Printed at the Bengal Secretariat press, 1892, Ethnographic Glossary, Vol.1, P.-388

৫৯. পূর্বোক্ত

৬০. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩

৬১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৫

৬২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮২

৬৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯৭

৬৪. ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ, গৃহকোণ (প্রবন্ধ), বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, সম্পা.- ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৪২২, পৃঃ ৪২৫

৬৫. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃঃ ৭৯

৬৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯১

৬৭. সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য, হরিদাস, স্মৃতিচিন্তামণি:, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৫, পৃঃ ২৩,

৬৮. Zimmer, Heinrich, Myths and symbols in Indian art and civilization, Edited by Joshep Cambell, New York city, 1945, 1946, Renewed 1973 by Princeton University press, Print Motilal Banarsidass Publishers Privated Ltd; Delhi, 2015, P.-186

৬৯. Birdwood, George C.M., The Arts of India, C.S.I.M.D. Edin, British Book Company, 3rd Edition-1986, First Pub.-1880, Lamottee Street, Jerssy, CI,UK, P.-169

৭০. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩,

৭১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৬

৭২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৮

৭৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৪

৭৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪১

৭৫. Cirlot, J.E, A Dictionary of symbols, Second Edition, Translated from the spanish by Jack sage, London, Routledge and kegon paul Ltd., 1962, Second Edition-1971, P. 31

৭৬. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন,নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃঃ ৪১

৭৭. রায়, নীহাররঞ্জন, বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, আশ্বিন ১৪২০, পৃঃ ৪২

৭৮. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃঃ ৯১

৭৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৯২

৮০. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭১

৮১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৫

৮২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৬

৮৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৭

৮৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৮

৮৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৬৮

৮৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৬৮

৮৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৬৮

৮৮. Zimmer, Heinrich, Myths and Symbols in Indian Art and Civilization, Edited by Joshep Cambell, New York City, 1945, 1946, Renewed 1973 by Princeton University Press Reprint Motilal Banarsidass Publisher Private Ltd., Delhi, 2015, P. 186

৮৯. নির্ম্মলানন্দ, স্বামী, দেবদেবী ও তাঁদের বাহন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ ২১১, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ, ১৪১৮, পৃঃ ২১১

৯০. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃঃ ১৩

৯১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭৪

৯২. বন্দোপাধ্যায়, হরিচরণ, বঙ্গীয় শব্দকোষ (দ্বিতীয় খন্ড), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০০৪, পৃঃ ১২৫৭

৯৩. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃঃ ৮৪

৯৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৬৮

৯৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৬৮

৯৬. বন্দোপাধ্যায়, হরিচরণ, বঙ্গীয় শব্দকোষ (দ্বিতীয় খন্ড), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০০৪, পৃঃ ১৮০৫

৯৭. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃঃ ১০৪

৯৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৮০

৯৯. বাল্মীকি রামায়ণম্ : সুন্দরাকান্ড, সম্পা. : পঞ্চানন তর্করত্ন, বেণীমাধব শীলস লাইব্রেরী, কলকাতা, মে ২০১২, পৃঃ ৭২৬

১০০. মজুমদার, মোহিতলাল, মোহমুদ্গর (কবিতা), বিস্মরণী (কাব্যগ্রন্থ) মোহিতলাল মজুমদারের কাব্যসংগ্রহ, সম্পা. -ভবতোষ দত্ত, ভারবি, কলকাতা, ডিসেম্বর-১৯৯৭, পৃঃ ১৮০

১০১. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃঃ ৬৩

১০২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭৪

১০৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭১

১০৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭২

১০৫. দত্ত, রমেশচন্দ্র (অনূদিত ও সংকলিত), ঋগ্বেদ সংহিতা (মূল), ৫ম মন্ডল, ৫৫ সূক্ত, ৬।।, নিমাইচন্দ্র পাল (সম্পা.), সদেশ প্রকাশনী, ২০০৭, পৃঃ ৩১১

১০৬. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃঃ ৪৯

১০৭. ব্যাসদেব, মহাভারতম্ : আদিপর্ব্ব (২), দ্বিতীয় খন্ড, সম্পা. -হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, অগ্রহায়ণ-১৩৮৩ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৭৭৫

১০৮. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃঃ ২৬৮

১০৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭৬

১১০. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭২

১১১. দত্ত, রমেশচন্দ্র (অনুবাদক ও সংকলক), ঋগ্বেদ সংহিতা (মূল), ৫ম মন্ডল, ৫২ সূক্ত, ।।৬।।, নিমাইচন্দ্র পাল (সম্পা), সদেশ প্রকাশনী, ২০০৭, পৃঃ ৩০৮

১১২. Chowdhury, Saifuddin, Aspects of Material and Folk Culture in Bangaladesh, Bangla Academy, Dhaka-1000, 2003, P. 37